জীবন-জীবিকায়নে

# ক্ষুদ্রঋণ

১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
২০১২

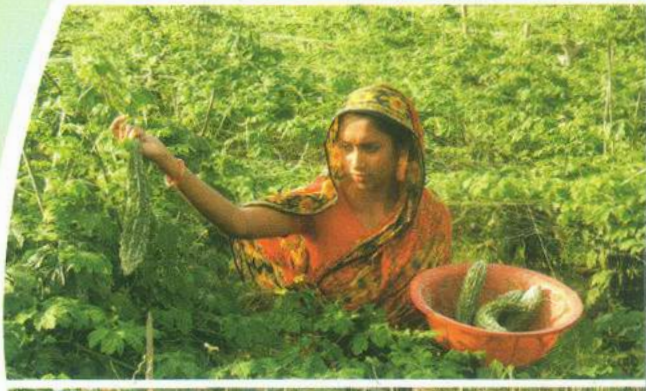

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

জীবন-জীবিকায়নে...

# প্রত্যয়ন

১ম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ ২০১২

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

# জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ

## ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের সাফল্যগাঁথা সম্বলিত কিছু কেসস্টাডি

**১ম বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা ঃ জুন ২০১২**

**প্রকাশনায়**
মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি নং- ১৯, রোড নং- ১২ (নতুন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা - ১২০৯

**উপদেষ্টা**
ড. এম. এহ্ছানুর রহমান
শফিকুল ইসলাম

**সম্পাদক**
মোঃ আসাদুজ্জামান

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোঃ রেজাউল ইসলাম

**কম্পিউটার গ্রাফিক্স**
মোঃ আমিনুল হক

**মুদ্রণ**
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

ISBN 978-984-8783-94-8

# সূচি পত্র


**শিউলি বেগম, একজন অগ্রগামী কিষাণী!** ০৭
মোঃ নাসিরউদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার

**ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ল অতিদরিদ্র ছবিরোন** ০৯
মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

**ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে রাবেয়া বেগম আজ স্বাবলম্বী** ১১
মোঃ খায়রুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার

**বাসন্তী রাণীর সংগ্রামী জীবন** ১৩
মোঃ জালালউদ্দীন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

**ঝুড়ি, ডালা আর কুলার সাথে স্বপ্নও বুনে কণিকা** ১৫
মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

**লাকী বেগমের জীবনের গল্প** ১৭
মোঃ খায়রুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার

**একজন হার না মানা রেজিয়ার গল্প** ১৯
মোঃ নিয়ামুল কবীর, প্রোগ্রাম অফিসার (কৃষি)

**পারুলের জীবন সংগ্রাম** ২১
মোঃ শামীমুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার

**সালেহা বেগমের দারিদ্র্য জয়** ২৩
দুলাল চন্দ্র দেবনাথ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

**মাশরুম চাষে রাশিদার সাফল্য** ২৫
মোঃ রেজাউল ইসলাম, সিঃ প্রোগ্রাম অফিসার

**জীবিকায়নের চিত্র** ২৭

# বাণী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রায় ২ দশক ধরে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই দুই দশকে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও সম্পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পার হয়ে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম একটি টেকসই ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি কৃষি বহুমুখীকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষি কর্মকাণ্ডের ওপর জোর প্রদান করেছে এবং সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে লিংকেজ বৃদ্ধি ও পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের অভিগম্যতা বাড়াতে মিশন গণকেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তিগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে অটোমেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যকর কৌশল হিসেবে সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।

'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' প্রকাশনাটিতে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সাফল্যগাঁথা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রকাশনাটি মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আমি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

**ড. এম. এহ্ছানুর রহমান**
নির্বাহী পরিচালক

# মুখবন্ধ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কাজ করে আসছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। জীবন-জীবিকা উন্নয়নের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে কৃষি বহুমুখীকরণ, উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ, বাজার চাহিদা সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর প্রদান করে। দারিদ্র্যের বহুমুখীনতাকে বিবেচনায় এনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা এবং মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি কর্মসূচির সমন্বয় ঘটিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরও সুসংহতকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০০৬ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সময়োপযোগী বহুমূখী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা দরিদ্র ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে।

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে অবদান রাখছে তা পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' শিরোনামে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণের কার্যক্রমের সাফল্যগাঁথা সম্বলিত কেস স্টাডি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সংকলনটিতে প্রকাশিত কেস স্টাডিগুলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মএলাকার বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত সংকলনটিতে গণকেন্দ্রভিত্তিক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মিশনের Branding Village প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

সংকলনটি প্রকাশের জন্য যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কাহিনীসমূহ রচনা করেছেন এবং মিশনের যে সকল কর্মকর্তা সংকলনটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

**শফিকুল ইসলাম**
পরিচালক, কর্মসূচি

# শিউলি বেগম, একজন অগ্রগামী কিষাণী!

মোঃ নাসিরউদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার

পায়রা নদীর কূল ঘেষে বরগুনা সদর উপজেলা। এই উপজেলার কেওড়াবুনিয়া ইউনিয়নে সবুজ শ্যামল ছায়া ঢাকা একটি গ্রাম শিংড়াবুনিয়া। গ্রামটিতে শুধু চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের সমারোহ। এই গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু শিউলি বেগম। মাত্র ১৪ বছর বয়সে শিংড়াবুনিয়া গ্রামের মোঃ ছিদ্দিকুর রহমানের সাথে তার বিয়ে হয়। এই বয়সে স্বামী-সংসার সম্পর্কে তেমন কিছুই বুঝতেন না শিউলি বেগম। সব সময় শ্বশুর শাশুড়ির বকা-ঝকা খেয়ে নীরবে শুধু কাঁদতেন তিনি। কিন্তু স্বামী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ছিল প্রবল, যার কারণে কোনো কষ্টই শিউলিকে হার মানাতে পারেনি। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই ২টি সন্তানের মা হন শিউলী বেগম। কিন্তু ২টি সন্তানই মেয়ে হওয়ায় শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদসহ পরিবারের সকলের গাল-মন্দ শুনতে হয় শিউলী বেগমকে। দিন দিন সংসারে অশান্তি বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে শিউলী ও তার স্বামী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান বাবার সংসার হতে আলাদা হয়ে যান। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ভাবতে থাকেন ২টি ছোট সন্তানসহ তাদের সংসার কীভাবে চলবে। শিউলী বেগম স্বামীকে সান্ত্বনা দেন; কষ্ট হলেও সংগ্রাম করে তারা বাঁচতে পারবে। শুরু হয় শিউলী বেগমের জীবন সংগ্রাম।

সবজি বাগান থেকে করলা আহরণ করছেন শিউলি বেগম

শিংড়াবুনিয়া গ্রামে ১৯৯৯ সাল হতে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি পরিচালনা করছে। শিংড়াবুনিয়া গ্রামের অনেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আশার আলো মহিলা দলের সদস্য হয়েছেন এবং সমিতি থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন। শিউলি বেগম মনস্থির করেন, তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আশার আলো মহিলা দলের সদস্য হবেন। তিনি উক্ত আশার আলো মহিলা উন্নয়ন দলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে তার ইচ্ছার কথা জানান। এভাবে ২০০৬ সালে তিনি আশার আলো মহিলা উন্নয়ন দলের সদস্য হয়ে ১০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন এবং নিয়মিত দলীয় সভায় উপস্থিত হয়ে মিশনকর্মীর নিকট থেকে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনা শুনেন। কিছুদিন পর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বরগুনা সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের উপকারভোগীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ২৫ জনকে বসতভিটায় সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। শিউলি বেগম উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি মিশন থেকে ৮,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে সবজি চাষ শুরু করেন। তাতে তার কিছু টাকা লাভ হয়। ফলে শিউলি বেগমের মনোবল এবং সাহস অনেক বেড়ে যায়। তিনি পুনরায় মিশন থেকে কৃষি প্রকল্পে ঋণ গ্রহণ করে সবজি চাষ অব্যাহত রাখেন।

বরগুনা জেলা নদী এবং সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় শিংড়াবুনিয়া গ্রামটি প্রায়ই প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার হয়। ২০০৭ সালে এলাকাটিতে প্রলয়ংকরী সাইক্লোন সিডরের আঘাতে মানুষ ও গবাদি পশু-পাখির প্রাণনাশ, ফসল এবং জীবন-জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শিউলী বেগমও প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আঘাত থেকে রক্ষা পাননি। সুপার সাইক্লোন সিডরের আঘাতে তার বসতভিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তার সবজি ক্ষেতের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়। শিউলী বেগম, স্বামী সন্তানদের নিয়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে কোনোমতে জীবন রক্ষা করলেও সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান।

কিন্তু জীবন থেমে থাকেনি। দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জন-জীবনের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং অন্যান্য সংস্থা উক্ত এলাকার দূর্যোগ প্রশমনে ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রদত্ত জরুরি ত্রাণ সুবিধা পাওয়ায় শিউলি বেগমের পরিবার সাময়িকভাবে দূর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করতে পারে। এ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসন থেকে ঘর মেরামতের জন্য ৩ বান টিন পান শিউলি বেগমের স্বামী ছিদ্দিকুর রহমান যা দিয়ে তারা তাদের ঘর পুনঃনির্মাণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সিডরের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য উক্ত এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের সবধরণের ঋণের কিস্তি পরিশোধ ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে দেয়। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগীদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন RESCUE নামে একটি বিশেষ ঋণ বিতরণ করে। এই ঋণ কর্মসূচিটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি নমনীয় সুদে পরিশোধযোগ্য একটি তিনবছর মেয়াদী ঋণ যাতে ছয় মাস রেয়াতী সুবিধা রয়েছে। শিউলি বেগম ১৫,০০০/- টাকা RESCUE ঋণ গ্রহণ করে পুনরায় সবজি চাষ শুরু করেন।

সিডর পরবর্তীকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিংড়াবুনিয়া গ্রামটিতে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ওপর জোর প্রদান করে। বিশেষ করে দূর্যোগসহিষ্ণু জাতের ফসল উৎপাদনে স্থানীয় সাধারণ ও প্রান্তিক চাষীদের উদ্বুদ্ধ করে। আশার আলো মহিলা দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শিউলি বেগমও আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষি চাষ সম্পর্কে অবগত হন। পরবর্তীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যকর এ্যাডভোকেসির ফলে ২০০৯ সালের শুরুর দিকে শিংড়াবুনিয়া গ্রামে বরগুনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আইপিএম, আইসিএম কম্পোনেন্টের আওতায় 'কৃষক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত কৃষক ক্লাবে শিউলি বেগম একজন কিষাণী হিসেবে সদস্য হন এবং সরকার প্রদত্ত কৃষক কার্ড লাভ করেন যা তাকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তির আওতায় আসতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কৃষক ক্লাবে এসে কৃষকদের মধ্যে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেন। কৃষক ক্লাবের সদস্য হওয়ার ফলে শিউলি বেগম আইসিএম-এর মাধ্যমে কীভাবে মাঠ ফসল উৎপাদন করা যায় সে সম্পর্কে মাঠ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যা তাকে সাধারণ কিষাণী থেকে একজন অগ্রগামী কিষাণী হিসেবে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে।

শুরু হয় শিউলি বেগমের জীবনের সফলতম অধ্যায়। মিশন থেকে কৃষি ও মৌসুমী ঋণ গ্রহণ করে আধুনিক প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ শুরু করেন শিউলি বেগম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কারিগরি সহায়তা ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পান তিনি। ধীরে ধীরে সবজি চাষে তার সফলতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চলতি বছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হতে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ হিসেবে ১,২০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিউলি বেগম সবজি খামার গড়ে তোলেন। এ বছর তিনি ২০০ শতক জমিতে করলা, চিচিংগা, কুমড়া, ফ্রুটি (বাংগী), সূর্যমুখী, মিষ্টি আলু, বাদামসহ নানা ধরণের সবজি চাষ করেন। গত বছরের তুলনায় এ বছর ভাল উৎপাদন হয়েছে। আশা করা যায় উৎপাদন খরচ বাদে ৮০/৯০ হাজার টাকা লাভ হবে।

বর্তমানে শিউলি বেগম ও তার স্বামী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান সারাদিন তাদের সবজি খামারে কাজ করেন। সবজি চাষের মাধ্যমে শিউলি বেগমের জীবনে সুখ ও সচ্ছলতা এসেছে। তার বড় মেয়ে শিংড়াবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। ছোট মেয়ের বয়স পাঁচ বছর। আগামী বছর তাকেও স্কুলে ভর্তি করাবেন শিউলি বেগম। যে শিউলি বেগম একদিন চরম হতাশায় ভুগছিলেন তিনি আজ সমস্ত হতাশাকে পিছনে ফেলে এসেছেন। শিউলি বেগমের দেখাদেখি শিংড়াবুনিয়া গ্রামের আরও অনেকে আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষি কাজ শুরু করেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যকর সহযোগিতার ফল হিসেবে শিংড়াবুনিয়া গ্রামটি হয়ে উঠেছে একটি অগ্রগামী কৃষকদের গ্রাম। যেখানে শোনা যায় শুধু জীবনের জয়গান।

# ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ল অতিদরিদ্র ছবিরোন

মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

যেদিন সবচেয়ে আদরের ছোট ছেলে জামাত আলী শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটিতে রাগের বশে বিষ পানে আত্মহত্যা করলো সেদিনের পর থেকে নিরুপায় হয়ে ভিক্ষার থলে হাতে উঠেছিল বাষট্টি বছরের ছবিরোন নেছার। ভিক্ষা না করে আর কোনো উপায় ছিলনা বিধবা না হয়েও বিধবার মত জীবনযাপন করা ছবিরোনের। কেননা পঁচিশ বছর হতে চলল তার কোন খোঁজ খবরই নেয়না স্বামী মহর আলী। ছবিরোনের জন্মের সাল-ক্ষণ জানা না থাকলেও ছবির মতো দেখতে সুন্দর হওয়ায় পিতা আমিন মুন্সি মেয়ের নাম রেখেছিলেন ছবিরোন। এক সময় নামটা আরও ছোট করে 'ছবি' বলে ডাকতো সবাই। চৌগাছা উপজেলার বড়নিয়ামতপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক পিতার পাঁচ মেয়ে আর চার ছেলের বড় সংসারে লেখাপড়ার স্বপ্ন কোনোদিন দেখেনি ছবিরোন। সবেচেয়ে ছোট আর আদরের মেয়েকে ঘন ঘন দেখতে পাবার ইচ্ছায় পাশের গ্রাম ছোট নিয়ামতপুরে বিবাহ দেন পিতা মাতা; সেও মাত্র দাঁত পড়েছিল সেই বয়সে। গরু ব্যবসায়ী স্বামীর সংসারে মোটামুটি সুখেই ছিল ছবিরোন। একে একে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান ছবিরোনের ঘর আলো করে আসে; কিন্তু তাদের কেউই তার জীবনে আলো জ্বালাতে পারেনি। ছোট ছেলেটি যাও একটু আশার আলো জ্বালিয়েছিল কিন্তু তাকে বিধাতা তুলে নিলেন অল্প বয়সে। এই ছোট ছেলেটিই তার ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছিল স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর।

গভীর মমতায় ছাগলের পরিচর্যা করছেন ছবিরোন

ছবিরোনের স্বামী মহর আলী এক সময় পেটে ঘা হয়ে মৃত্যুর দোড়গোড়ায় পৌছায়। অনেক টাকা পয়সা খরচাপাতি করলেও রোগ ভালো হয়না। অবশেষে জায়গা-জমি বেচে অপারেশন করা হলে কিছুটা সুস্থ হয় মহর আলী। বড় দুই ছেলে বিয়ে করে নিজেদের সংসার নিজেরা পেতেছে; মা-বাবার খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। অবশ্য সামর্থ্যও নেই তাদের। বাধ্য হয়ে শেষ সম্বল বসত ভিটাটুকু বিক্রি করে স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ছবিরোন এবং সেবার

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে স্বামীকে সুস্থ করে তুলে সে। অথচ এক সময় সেই স্বামীই তাকে ছেড়ে আর একটি বি করে অন্যত্র চলে যায়। সেই শুরু, এরপর একের পর এক বিয়ে করার নেশা পেয়ে বসে বিয়ে পাগল মহর আলীকে এ পর্যন্ত ১৬-১৭টি বিয়ে করেছে বলে সবাই জানে।

এভাবেই শুরু হয় ছবিরোনের দরিদ্রতার মাঝে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। তার ছোট জামাই শান্তি মিয়ার ঘরের সাথে অনে বাড়ি থেকে পুরাতন টিন সংগ্রহ করে একটি ছাবরা বানিয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করে এবং দিনের বেলা ভিক্ষা ক খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাতে থাকে ছবিরোন। শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক অসচেতনতার কারণে ছবিরোন জাতী ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় তালিকাভুক্ত হয়নি। ফলে অতিদরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা, ভিজিডি বা ভিজিএ কার্ডের মত জাতীয় নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত সেবাসমূহ থেকেও বঞ্চিত হয় সে। এভাবেই দিন কে যাচ্ছিল। কিন্তু ২০১০ সনের জুলাই মাসে হঠাৎ ছবিরোনের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। পাতিবি ইউনিয়নের নিয়ামতপুর গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহায়তায় পরিচালিত চাঁদনী গণকেন্দ্রের সদস্যরা ছবিরোনে সহায়তায় এগিয়ে আসে। ছবিরোন জানতে পারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অতিদরিদ্রদের দারি বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় একটি বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হাতে নিয়ে এবং অতিদরিদ্র জনগণকে উক্ত কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ ও সুলভ ঋণসুবিধা প্রদান করছে। প্রতিবেশী চাঁদ গণকেন্দ্রের সদস্যদের পরামর্শক্রমে চাঁদনী মহিলা উন্নয়ন দলে ভর্তি হয় ছবিরোন। মিশনের সমিতি ও গণকেন্দ্রে সদস্যদের সাথে আলোচনা করে ছবিরোন উপলব্ধি করে ভিক্ষাবৃত্তি এক ধরণের অপমানজনক কাজ। তাই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গণকেন্দ্রের সদস্যদের সহায়তায় একই গ্রামের আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে ঝি'য়ের কাজ শু করে। প্রতিদিন সকাল সাতটায় গিয়ে ঘর মোছা, উঠান ঝাড়ু দেয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, গোয়াল ঘর পরিষ্ক করার কাজ করে তিনবেলা খাবার এবং মাসিক ৩০০/- টাকা মাইনে পায় ছবিরোন। সেখান থেকে সমিতিে সাপ্তাহিক ১০/- টাকা হারে সঞ্চয় জমা শুরু করে সে। ইতোমধ্যে গণকেন্দ্রের সদস্যরা ছবিরোনের জাতীয় পরিচয়প এবং ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে তাকে ভবিষ্যতে বয়স্ক-ভাতা এবং ভিজিডি ভিজিএফ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এরপর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চৌগাছা শাখা অতিদরিদ্রদের জন্য ছাগ পালনের ওপর দুই দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করলে ছবিরোন ঐ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সমিতি সকলের পরামর্শে অতিদরিদ্র ক্ষুদ্রঋণের আওতায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং ঐ টাকা দিয়ে দু'টি ছাগ কিনে লালন পালন শুরু করে ছবিরোন। ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয়। অল্প পুঁজি, অল্প জায়গা ও অল্প শ্রমে ছাগ পালন করে সহজেই লাভবান হওয়া যায়। ছাগল প্রতি ছয়মাস অন্তর দু'টি করে বাচ্চা প্রসব করে। ছাগল পালন শু করার কিছুদিনের মধ্যে ছবিরোনের একটি ছাগলের দুটি বাচ্চা হয়। ছবিরোন পরিকল্পনা করে এভাবে সমিতি থে ঋণ নিয়ে পর্যায়ক্রমে সে একটি ছাগলের খামার গড়ে তুলবে এবং একসময় অন্যের বাড়িতে কাজ করা বাদ দি নিজে স্বাবলম্বী হবে। ছবিরোন ভাবে এভাবে বাকি জীবন পার করে দিতে পারলে পরপারে গিয়ে ঠিকই সে স্বামী মহ আলীকে নিজের কাঠ-গড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। যে স্বামীর জীবন বাঁচাতে এত কিছু করল ছবিরোন সেই স্বামী তাকে চিনলনা। অনেক না পাওয়ার এ জীবনে ছবিরোন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অতিদরিদ্র ঋ প্রকল্পের মাধ্যমে যেমনি করে সে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়েছে, তেমনি সে আর দশজন মানুষের মত ছাগল পালনের মাধ্য স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

# ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে রাবেয়া বেগম আজ স্বাবলম্বী

মোঃ খায়রুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার

যশোর সদর উপজেলার হৈবতপুর ইউনিয়নের শাহাবাজপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে রাবিয়া বেগমের বাস। তাঁর বয়স তেত্রিশ বছর। দুই পুত্র সন্তান ও শাশুড়িসহ পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার স্বামী মোঃ আবুল কাশেম পেশায় একজন দরিদ্র কৃষক। রাবেয়া বেগমের স্বামীর একা আয় দিয়ে সংসারের ব্যয় বহন করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত পরিবারটিতে সারাবছর অভাব অনটন লেগেই থাকতো।

একদিকে দরিদ্রতা ও অন্যদিকে সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় রাবেয়া বেগম ছিলেন হতাশাগ্রস্ত। তিনি পরিবারের দরিদ্রতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিকল্প আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন। এরই মধ্যে শাহাবাজপুর গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জোনাকী মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের পরামর্শে ২০০৭ সালে ঐ সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন রাবেয়া বেগম। তিনি সমিতির ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভায় যোগদান এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাঠকর্মী ও সমিতির সদস্যদের পরামর্শে সংসারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন এবং বাড়ির পাশে সবজি চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন রাবেয়া বেগম। পরবর্তীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত সবজি চাষ বিষয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি।

রাবেয়া বেগম নিজের সবজি বাগান থেকে পটল আহরণ করছেন

রাবেয়া বেগম তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সমিতির মাধ্যমে ঢাকা আহছানিয়া মিশন থেকে প্রথম দফায় ৮,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কিছু হাঁস-মুরগি ক্রয় এবং বাড়ির পাশে দুই কাঠা জমি লিজ নিয়ে পুঁইশাক, কুমড়া ও শিম চাষ শুরু করেন। তার প্রকল্পটি সফলতার মুখ দেখতে পায়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রাবেয়া বেগমকে ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং প্রত্যেক দফায় ঋণের পরিমাণ বাড়ায়। এতে উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বেগম তাঁর সবজি চাষ প্রকল্পটিকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেন এবং কারিগরি সহায়তার জন্য যশোর সদর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

চলতি বছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় হৈবৎপুর ইউনিয়নের শাহাবাজপুর গ্রামটিকে পটল চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি আদর্শ পটল উৎপাদনকারী গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হৈবৎপুর ইউনিয়নের শাহাবাজপুর গ্রামটিতে মাঠ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণটি যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কৃষি কর্মকর্তারা যৌথভাবে পরিচালনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে শাহাবাজপুর গ্রামে মিশনের উপকারভোগী ছাড়াও সাধারণ ও প্রান্তিক চাষীরাও অংশগ্রহণ করেন। রাবেয়া বেগম ও তার স্বামী মোঃ আবুল কাশেম এই প্রশিক্ষণটিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর রাবেয়া বেগম তার স্বামীর সহযোগিতায় বাড়ির পাশে আরও ৪ বিঘা জমি বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকায় লিজ নিয়ে বৃহৎ আকারে পটল চাষ কার্যক্রমের পরিকল্পনা করেন।

চলতি বছরে ঢাকা আহছানিয়া মিশন থেকে ৬০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে মাঘ মাসে পটলের চারা রোপণ করেন রাবেয়া বেগম। চৈত্র মাসের শেষ থেকে পটল বিক্রি শুরু হয়। সপ্তাহে ১০-১২ মণ পটল বিক্রি হয়। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১১০-১১৫ মণ পটল পাইকারী বিক্রি হয়েছে এবং এতে তার সব খরচ বাদে ৩০,০০০/- টাকা লাভ হয়েছে। রাবেয়া বেগম আশা করছেন এই মৌসুমে ঐ চার বিঘার পটল ক্ষেত থেকে ৩০০-৩৫০ মণ পটল বিক্রি করতে পারবেন এবং ৫০,০০০/- টাকা থেকে ৬০,০০০/- টাকার মত লাভ করতে পারবেন। রাবেয়া বেগমের পটল ক্ষেত থেকে সপ্তাহে দুই দিন পটল তোলার জন্য পাঁচজন খণ্ডকালীন শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া প্রতি মাসে পটল ক্ষেতের ঘাস নিড়ানী, পানি দেয়া ও পরিচর্যার জন্য সাতজন খণ্ডকালীন শ্রমিক নিয়াগ করতে হয়। রাবেয়া বেগমের সফলতা দেখে তাঁর প্রতিবেশীরাও উদ্বুদ্ধ হয়ে সবজি চাষ শুরু করেছেন।

রাবেয়া বেগম এখন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল। তিনি দারিদ্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। রাবেয়া বেগমের বড় ছেলে ৭ম শ্রেণিতে এবং ছোট ছেলে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। পটল ক্ষেতের আয় থেকে রাবেয়া বেগম নিজের নামে দশ শতক জমি ক্রয় করেছেন, দুটি গাভী ক্রয় করেছেন এবং নিজে থাকার ঘরটিতে টিনের ছাউনি দিয়েছেন। এ ছাড়াও একটি পাকা স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন এবং নিজের বাড়িতে একটি টিউবওয়েল বসানোর চিন্তা করছেন।

রাবেয়া বেগমের স্বপ্ন ছেলে দুটিকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নিজের সবজি চাষ উদ্যোগটিকে সম্প্রসারণের জন্য আরো জমি ক্রয় করা। রাবেয়া বেগম দরিদ্রতার শিকল থেকে মুক্ত হয়ে একজন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। রাবেয়া বেগম গর্ব করে বলেন, সমাজে সবার কাছে এখন আমরা সম্মান ও মর্যাদা পাই যা কখনো কল্পনা করতে পারিনি।

# বাসন্তী রাণীর সংগ্রামী জীবন

মোঃ জালালউদ্দীন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

বাসন্তী রাণী দাস, একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার নাম। কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কারণে সমাজে আজ তিনি নিজেকে একজন সফল ও স্বাবলম্বী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্যাসকেটের মত একটি ব্যতিক্রমী ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠা করে নিজের এবং আরও অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তিনি দরিদ্রতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়েছেন। পরিবারের জন্য নিশ্চিত করেছেন নিরাপদ আগামী।

বাসন্তী রাণী দাসের বাবার বাড়ী বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার খাজুরী গ্রামে। দশ ভাই-বোনের সংসারে অভাব অনটনের কারণে ৩য় শ্রেণির বেশি আর স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই কিশোর বয়সেই বাড়ির কাছে গ্যাসকেট কারখানায় খণ্ডকালীন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে বাবার সংসারে অর্থের যোগান দিতে হতো তাকে। যখন বাসন্তী রাণীর বয়স মাত্র ১৩ বছর তখন তার বিয়ে হয় যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের উত্তম কুমার দাসের সাথে সেই ১৯৯৮ সালে। বাসন্তী রাণীর স্বামী উত্তম কুমার দাসের পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল চামড়া বিক্রি। সেই সুবাদে ছোটবেলা থেকেই উত্তম কুমার গরু ছাগলের চামড়া গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে কেশবপুর বাজারে বিক্রি করত। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বাসন্তী রাণীর ৪টি সন্তানের জন্ম হয়। ইতোমধ্যে উত্তম কুমারের চামড়া বিক্রয়ের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। যা মালামাল ক্রয় করা ছিল তা বিক্রয় করে অর্ধেক বিনিয়োগও উঠে আসেনা। ফলে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে নিঃস্ব

নিজের কারখানায় গ্যাসকেট তৈরি করছেন বাসন্তী রাণী

হয়ে যায় উত্তম কুমার। ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায়; সংসারে নেমে আসে চরম দুর্দিন। বাসন্তী রাণী চোখে অন্ধকার দেখেন। মনে পড়ে বাবার বাড়িতে থাকার সময় গ্যাসকেট তৈরির কারখানায় কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা (**গ্যাসকেটঃ** একটি ধাতব পদার্থের ওপর যখন আরেকটি ধাতব পদার্থ রাখা হয় তখন মাঝখানের কিছু অংশ ফাকা থাকে। এই ফাঁকা অংশ বন্ধ করার জন্য গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়। এটি এক ধরণের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ যা সাধারণত বাস, ট্রাক, মটরসাইকেল এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়)। বাসন্তী রাণী বাবার বাড়ী যান এবং গ্যাসকেট তৈরির কারখানার মালিকের সাথে পরামর্শ করে নিজের স্বামীর বাড়ীতে ক্ষুদ্র আকারে গ্যাসকেট তৈরি শুরু করার পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসার পুঁজি। পুঁজি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পরেন বাসন্তী রাণী। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন বাসন্তী রাণী। বাজিতপুর গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চাঁদেরহাট মহিলা উন্নয়ন দলের ফিল্ড অর্গানাইজারের সাথে আলাপ করে দলে ভর্তি হওয়ার আগ্রহের কথা জানান তিনি। এভাবে চাঁদেরহাট দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন বাসন্তী রাণী। কিছুদিন পর সমিতি থেকে ১৫,০০০/- গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেন তিনি। সেখান থেকে স্বামী উত্তম কুমারের মাধ্যমে ৭,০০০/- টাকা দিয়ে গ্যাসকেট তৈরির কয়েকটি ডাইসসহ যন্ত্রপাতি ও ৫,০০০/- টাকা দিয়ে ঢাকা থেকে কিছু শুকনো চামড়া ক্রয় করে এনে প্রাথমিকভাবে ছোট আকারে গ্যাসকেট তৈরির কাজ শুরু করেন। কারখানায় উৎপাদিত বিভিন্ন সাইজের বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেলের গ্যাসকেট যশোরসহ আশেপাশের বাজারে বিক্রি করে মোটামুটি চলতে থাকে। আস্তে আস্তে বাসন্তী রানীর উৎপাদিত গ্যাসকেটের সুনাম মার্কেটে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পায়। যত উৎপাদন তত বিক্রি। বাসন্তী রাণী ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইতোমধ্যে পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে আরো ২৫,০০০/- ঋণ নিয়ে ১টি মেশিন ও আরও বেশি পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে বাসন্তী রাণী। ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে এ কাজে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি পাড়ার বেকার-যুবক এবং মহিলাদের সংগঠিত করে কাজ শিখিয়ে তাদেরকে দিয়ে চামড়ার ওয়াসারসহ গ্যাসকেট কাটার কাজ চুক্তিভিত্তিক করানো শুরু করেন। এ কাজ খুবই সহজ; শুধু ডাইস এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলেই হয়। এতে একজন মহিলা বা পুরুষ দৈনিক ৪-৫ হাজার ওয়াসার কাটতে পারে। পারিশ্রমিক হাজার প্রতি ৫০/- টাকা।

পরের বছর ৩০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তিনি আরও ১টি মেশিন ক্রয় করেন। ব্যবসা বড় হতে থাকে এবং বাসন্তী রাণীর কারখানায় একসেল, টাইমিং, ফারিং, ওয়াটার পাম্প, ফুয়েল পাম্প, চেম্বার, সাইটা, গিয়ার কিটস, পথ প্যাকিন, ট্রাপিট, টাইমিং প্লেট, হেড বুশটার, মবিল ফিল্টারসহ প্রায় ১০৮ প্রকার গ্যাসকেট তৈরি হয়। এসব উৎপাদিত যন্ত্রাংশের দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর চাহিদা আছে কিন্তু সরবরাহ কম। ফলে বিপণনের কোনো সমস্যা হয় না।

বাসন্তী রাণীর কারখানায় কাজ করতে খুব বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না বিধায় এখানে প্রতিবন্ধীরাও কাজ করতে পারে। তার কারখানায় বর্তমানে তিনজন প্রতিবন্ধী কাজ করে। কারখানায় কোনো ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না, ফলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় বাসন্তী রাণীর উৎপাদিত পণ্য পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় হচ্ছে। তবে যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, মাদারীপুর, সাতক্ষীরা, মাগুরা জেলায় বেশি পরিমাণ সরবরাহ ও বিক্রয় হয়ে থাকে। এসব উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন জেলায় বিপণনের দায়িত্ব পালন করেন বাসন্তী রাণীর স্বামী উত্তম কুমার।

বর্তমানে বাসন্তী রাণীর চার ছেলে-মেয়েসহ পরিবারের সবাই এ কাজে নিয়োজিত। চারটি বড় মেশিনে চারজন শ্রমিক সার্বক্ষণিক মাসিক ৬,০০০/- টাকা বেতনে কাজ করছে। বাসন্তী রাণীর দেখাদেখি গ্রামের আরো কয়েকটি পরিবার এই গ্যাসকেট এবং ওয়াসার উৎপাদনে জড়িত হয়েছে। এখন কেশবপুরের বাজিতপুর গ্রামের প্রায় ৪৫টি পরিবার এই ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উৎপাদনে জড়িত রয়েছে। বাজিতপুর গ্রামে গেলে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে চামড়ার বিভিন্ন ধরণের গ্যাসকেট, ওয়াসার তৈরির কাজ চলছে। ছেলে মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি, বৌ-শাশুড়ি সবাই আনন্দের সাথে কাজ করছে। বাসন্তী রাণীর কারখানায় প্রতি সপ্তাহে ২০-৩০ হাজার টাকার ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বিক্রয় হয়। বাসন্তী রাণী দুই ছেলের নামে কারখানার নাম রেখেছে 'শুভ-সৌরভ জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজ' এবং গ্যাসকেট প্যাকেটের নাম রেখেছেন মেয়ের নামে 'রিম গ্যাসকেট'।

বাসন্তী রাণী জীবনের সংকটময় পথ অতিক্রম করে নিজের এবং পরিবারের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। বাসন্তী রাণীর পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তার চার ছেলে-মেয়েই স্কুলে কলেজে পড়াশুনা করছে। তিনি নিজের নামে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন এবং বসতভিটা মেরামত করেছেন। নিজ বাড়িতে ১টি স্যানেটারী ল্যাট্রিন ও ১টি টিউবওয়েল বসিয়েছেন। নিজ পরিবার এবং সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই বাসন্তী রাণীর সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। একদিন আমি নিজে শ্রমিক ছিলাম আর এখন আমি নিজে হাতে শ্রমিকদের মুজুরী দিতে পারি এটাকে বাসন্তী রাণী তার জীবনের উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেন।

# ঝুড়ি, ডালা আর কুলার সাথে স্বপ্নও বুনে কণিকা

মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

বাংলা ১৪১১ সালের ৮ই শ্রাবণ। দিনটি কণিকা দাসীর জন্য বছরের অন্যান্য দিনের মতো সাধারণ কোনো দিন নয়। এটি অতি বেদনা, উৎকণ্ঠা আর অশ্রু ঝরার দিন। এ দিন সন্ধ্যা থেকেই আকাশের মুখ ভার, রাত বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে শুরু করে শ্রাবণের ধারা; আর সেই সাথে সাথে বাড়তে থাকে কণিকার অসহনীয় প্রসব যন্ত্রণাও। রাত ১২টায় হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য শ্রাবণের ধারা বন্ধ হলে স্বস্তি পায় কণিকা, জন্মগ্রহণ করে তার ছোট মেয়ে তুলসি। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবারও শুরু হয় অঝর ধারায় বৃষ্টি। এবার যেন স্বস্তির বৃষ্টি নয়; কণিকার অশ্রু বর্ষণ। রাত ১২টা ৩০ মিনিটে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায় কণিকার জন্মদাতা পিতা। আতুড় ঘর থেকে শেষ দেখা হলোনা জন্মদাতার চিরচেনা প্রিয় মুখটি। শুধু মনের চোখ আর কল্পনার আয়নায় দেখতে পায় কণিকা অনাকাঙ্ক্ষিত শবযাত্রা। সৃষ্টিকর্তার এ করুণ নিয়তির কাছে অসহায় মানুষের যেন কোনো কিছুই করার থাকেনা। এই একই দিনে কণিকা দাসীর স্বামী গোষ্ঠগোপাল ধার-দেনা করে দেউলিয়া হয়ে যায়। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর অনাগত ভবিষ্যৎ চিন্তায় কণিকা উৎকণ্ঠিত হয়। কণিকা জানে সংসার সাগরে সুখ-দুঃখ তরঙ্গের খেলা, আশা তার একমাত্র ভেলা। সে আশার ভেলায় সওয়ার হয়ে পাড়ি দিতে হবে জীবন নামের তরঙ্গবহুল এ জগত সংসার। তাইতো আর থেমে থাকা নয়। নতুন স্বপ্ন আর আশা নিয়ে পরিবারের সুদিন ফিরিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় কণিকা দাসী।

বাঁশ-বেতের কাজ করছেন কণিকা দাসী

পিতা শ্রীমন্ত দাস, মাতা রাজকুমারী, ৬ বোন আর ৪ ভাই মিলে ১২ জনের বৃহৎ পরিবার বাবার। বাবা যশোর জেলার সদর উপজেলার গুগুলিয়া গ্রামে নিজের বাড়িতে বাঁশ-বেতের কাজের পাশাপাশি অন্যের জমিতে মজুরী খেটে কোনোমতে সংসার চালাতেন। ১০ ছেলেমেয়ের কাউকে স্কুলের বারান্দা অবধি পাঠাতে পারেননি। অভাবের সংসারে ৬ মেয়ে অনেক ভারি বোঝা বৈকি। সদ্য কৈশরে পা দেয়া যে বয়সে মেয়েদের মায়ের আঁচলের নীচে থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বায়না করার কথা; যে বয়সে লাল ফিতা আর কাঁচের চুড়ি না পাওয়ার অভিমানে দিন পার করার কথা সে বয়সেই পিতা শ্রীমন্ত

দাস মেয়েদের বিয়ের আয়োজন করেন। ৪র্থ মেয়ে কণিকার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঋষী সমাজের প্রথা মেনে মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতা শ্রীমন্ত দাস মেয়ে কণিকা দাসীকে বিয়ে দেন যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার পাতিবিলা ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামের নিরাপদ দাসের ছেলে গোষ্ঠগোপাল দাসের সাথে। স্বামীর বাড়িতে এসে কিছুদিন ভালোই ছিল কণিকা কিন্তু একে একে ৪ মেয়ে আর ১ ছেলে তাদের সংসারে জন্ম নেয়ায় তাদেরও ৭ জনের বড় পরিবার হয়ে যায়। স্বামী নিজে অনিয়মিত বাঁশ বেতের কাজ করলেও বেশির ভাগ সময় অন্যের জমিতে মজুরি দেয়। আয়-রোজগার যা হয় তা দিয়ে তাদের সংসার কোনোমতে চলে। ধার-দেনা করে এক পর্যায়ে দেউলিয়া হয়ে নিরুপায় গোষ্ঠগোপাল চোখে অন্ধকার দেখে। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আবার সংসারে নতুন সন্তানের আগমন ঘটে। সংসারে অভাব অনটন বাড়ে। কি করবে, কোথায় যাবে, কীভাবে বাঁচবে ইত্যাদি নানান চিন্তা পেয়ে বসে কণিকা দাসীকে। ভাবতে ভাবতে একসময় কণিকা চিন্তা করে পূর্ব-পুরুষদের পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে স্বামীর পাশাপাশি নিজেও কিছু আয়-রোজগার করতে পারলে সংসারে স্বচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে। কণিকা ছোটবেলায় দেখেছে বাবা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, টেপারি, কুলা তৈরি করতো। এ কাজে সে অনেক সময় সহায়তা করতো আর নিজেও শখের বসে কিছু তৈরি করতো। কণিকা ভাবে আর ভাবে। এক সময় স্বামীকে নিজের ইচ্ছার কথা বলে। স্বামী তাকে সহায়তার আশ্বাস দিলে কণিকা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সে নিজেও কুটির শিল্পের কাজ করবে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজি। এমন সময় আশার আলো দেখতে পায় কণিকা। পাশের বাড়ির রেক্সনা দাস কিছুদিন ধরে তাকে বলছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কিছু একটা করতে। তাই সে একদিন রেক্সনা  বৌদি'র সাথে দেখা করে তার আগ্রহের কথা জানায়। সে তাকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সৈকত মহিলা উন্নয়ন দলে সদস্য হতে পরামর্শ দেয়। রেক্সনা এ সমিতির সভানেত্রী। সে পরদিন কণিকাকে সমিতিতে এসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উন্নয়ন কর্মীর সাথে পরিচিত হয়ে উক্ত সমিতিতে তার সদস্য হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে বলে। সমিতির নিয়ম-কানুন সব শুনে কণিকা স্বামীর সাথে কথা বলে মিশনের সৈকত মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ১০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ১৫,০০০/- টাকা গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে বাঁশ-বেতের কাজ শুরু করে। প্রথম প্রথম কাজ করতে ভালো লাগতো না। বাঁশ কিনে আনা, বাঁশ চেঁছে বেতি তৈরি করা, তৈরিকৃত জিনিস বিক্রয় করা; এসবই নিজের কাছে অলস আর ঝামেলাপূর্ণ মনে হতো। এভাবে মাস চারেক যাওয়ার পর আগ্রহ না হারিয়ে নিরুপায় অসহায়ের ন্যায় কোনোমতে কাজ করে যেতে থাকে কণিকা। একদিন চৌগাছার এক কুটির শিল্পের আড়তদারের সাথে মিশনকর্মী কণিকার যোগাযোগ করিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী সেখানে গিয়ে কাজ পছন্দ করে তৈরিকৃত মালামাল ন্যায্যমূল্যে ক্রয়ের আশ্বাস প্রদান করে। কণিকার দুর্ভাবনা দূর হয় এবং দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে সে আবার কাজ শুরু করে। কাজ করতে তখন যেন আর কোনো কষ্টই মনে হয়না। স্বামীকে এখন আর অন্যের কাজে যেতে দেয়না। তার প্রধান কাজ আশেপাশের গ্রাম থেকে তল্লাবাঁশ ক্রয় করে বাড়িতে এনে বাঁশ চেঁছে বেতি তৈরি করা, বাকী কাজ কণিকার। মনের মাধুরী মিশিয়ে আপন হাতে পরম মমতায় কণিকা বাঁশের ঝুড়ি, ডালা, টেপারী, ডোল, কুলা, টোপর ইত্যাদি তৈরি করে আর স্বপ্ন বুনে কোনো এক যাদুর বলে বিশ্বনাথপুর ঋষী পল্লীতে বসবাসরত ৩০টি পরিবারকে একই সুতোয় রেখে কীভাবে বিনি সুতোয় মালা গেঁথে এ পেশায় সম্পৃক্ত করা যায়। তাহলে যে সবারই লাভ। বড় একটি বাজার সৃষ্টি হবে। দূরের শহর থেকে নামীদামী ব্যবসায়ীরা এসে চড়ামূল্যে কিনে নিয়ে যাবে তাদের তৈরিকৃত সামগ্রী। কণিকা হিসেব করে দেখে ৮০-১০০/- টাকার একটি বাঁশে ৬-৭টি জিনিস বানানো যায়। অন্যান্য খরচ বলতে বাঁশ পরিবহনে ভ্যান ভাড়া, তার ও সুতালী ক্রয়। একজন দিনে ৬-৭টি জিনিস বানাতে পারে অনায়াসে এবং সকল খরচাপাতি বাদে প্রতিদিনে ১৮০-২৫০/- টাকা আয় করা খুবই সহজ।

কৃষি প্রধান চৌগাছা এলাকায় বাঁশের তৈরি সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা থাকা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং ন্যায্য মজুরি পাওয়ায় এ পেশায় কণিকা অনেক সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাই ১ম দফায় গৃহীত ঋণের টাকা সফলভাবে পরিশোধ করে মিশন থেকে ২য় দফায় ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে কুটির শিল্পের কাজে আনন্দচিত্তে মনোনিবেশ করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে একসাথে কাজ করায় তাদের সংসারে স্বচ্ছন্দ ফিরে আসে। স্বামীকে এখন আর পরের ক্ষেতে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে হয়না। একমাত্র ছেলে আর ছোট মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন কণিকা। ঋণের কিস্তি পরিশোধে এখন তার আর কোনো সমস্যা হয়না। সামনের বছর বাড়িতে একটি টিনের ঘর তোলার ইচ্ছা রয়েছে। আর ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি দোকান করার ইচ্ছে আছে কণিকা দাসীর। ঋষী পল্লীতে বসবাস করে উন্নত জীবন-যাপন বলতে যা বোঝায় কুটির শিল্পের এ পেশার মাধ্যমে তার সবই সম্ভব বলে কণিকা মনে করে। কণিকা বলে মানুষের স্বপ্ন থাকে অনেক; সাধ্যের মধ্যে থাকা স্বপ্নগুলো পুরণে চাই বিশ্বস্থ কারো পৃষ্ঠপোষকতা; অনুকূল পরিবেশ আর প্রয়োজনীয় সহায়তা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার স্বপ্ন পুরণে যে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা তাকে প্রদান করেছে সেজন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে কণিকা দাসী জানায় সশ্রদ্ধ প্রণাম।

# লাকী বেগমের জীবনের গল্প

মোঃ খায়রুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার

যশোর সদর উপজেলার গোপ বেলতলার এক দরিদ্র পরিবারে লাকী বেগমের জন্ম। দরিদ্র পরিবারে জন্মের পরও কষ্ট করে এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করে লাকী বেগম। এইচ.এস.সি পাস করার পর বাবা ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের মামুন মিয়ার সাথে তার বিয়ে দেন। দুই বছরের মাথায় লাকীর কোল জুড়ে আসে একটি কন্যা সন্তান। লাকী বেগমের স্বামী মামুন মিয়া ঢাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে ছোট পদে চাকরী করে। স্বামীর উপার্জনে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে দুই মেয়ে ও এক ছেলের জন্ম হয়। সংসারের সদস্য সংখ্যা বাড়লেও আয় বাড়ে না। একা মামুনের আয়ে সংসার চলে না। এক পর্যায়ে মামুন চাকরী ছেড়ে গ্রামে চলে আসে। গ্রামে, একটা কিছু করে সংসার চালাবে এই ভাবনায়। কিন্তু গ্রামে আসার পর কোনো কাজেই সে ভালো করতে পারছিল না। এদিকে সংসারের খরচ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। অভাব হয়ে দাঁড়ায় তাদের জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী। লাকী বেগম সব সময় চিন্তা করে যেভাবেই হোক সংসারের এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

রং-বেরঙের ঝাড়ু তৈরিতে ব্যস্ত লাকী বেগম

উপায়ান্তর না দেখে এক সময় লাকী বেগম তার স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়ী যশোরে চলে আসে। লাকী বেগম ও তার স্বামী সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁরা খেজুর পাতা দিয়ে ঝাড়ু তৈরি করে যশোর শহরে বিক্রি করে সংসার চালাবে। তবে এই খেজুর পাতার ঝাড়ুর মধ্যে একটি নতুনত্ব থাকবে। এটি হবে প্লাষ্টিকের হাতলযুক্ত আধুনিক খেজুর পাতার ঝাড়ু। যশোর এলাকায় খেজুর পাতা খুব সহজে নামমাত্র মূল্য দিয়ে ক্রয় করা যায়। তাই তারা খেজুর পাতা দিয়ে ঝাড়ু বানানো শুরু করে। খেজুর পাতার প্লাষ্টিকের হাতলযুক্ত ঝাড়ু যশোর শহরে বিক্রি করে যে পরিমাণ লাভ হয় তা দিয়ে কোনো রকমে দু'বেলা খাবারের সংস্থান হয় তাদের। কিন্তু ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগান কঠিন হয়ে পড়ে। লাকী বেগম ও তার স্বামী উপলব্ধি করে যদি ঝাড়ু তৈরি বাড়ানো যায় তাহলে লাভ বেশি হবে কারণ এখানে ঝাড়ু বিপণনের ভালো সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ব্যবসার পরিধি বাড়াতে হলে যে পরিমাণ পুঁজির দরকার সে পরিমাণ পুঁজি

তাদের নেই। লাকী বেগম আত্মীয় ও পরিজনদের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েও ব্যর্থ হয়। সে সময় তাঁর পাশের বাসার এক মহিলার নিকট জানতে পারে তাদের এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবন-জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র এলাকার অনেক মহিলাই মিশনের ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করেছে।

২০০৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সংগঠিত দোয়েল মহিলা সমিতির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় লাকী বেগম। সমিতিতে ভর্তি হয়ে কয়েক সপ্তাহ সঞ্চয় জমা করার পর প্রথম ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে তার ঝাড়ু তৈরি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে লাকী বেগম। এভাবে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়বার ১৫,০০০/- টাকা, তৃতীয়বার ৩০,০০০/- টাকা এবং চতুর্থবার তিনি ৭০,০০০/- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করে তার ভাড়া বাসায় পর্যায়ক্রমে ছোট আকারে ঝাড়ু তৈরির কারখানা গড়ে তুলে সে।

বাজারে তাঁর উৎপাদিত ঝাড়ুর চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। কেননা বাজারে সচরাচর যে সমস্ত খেজুর পাতার ঝাড়ু পাওয়া যায় তার সাথে লাকী বেগমের খেজুর পাতার ঝাড়ুর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সাধারনত খেজুর পাতার ঝাড়ুতে বাঁশ দিয়ে হাতল তৈরি করা হয়ে থাকে যা বেশি দিন টেকসই হয় না; অপরদিকে লাকী বেগমের ঝাড়ুতে প্লাস্টিকের হাতল ব্যবহার করা হয়। এতে লাকী বেগমের তৈরীকৃত ঝাড়ু ২-৩ বছর টেকসই হয়ে থাকে। বর্তমানে তার উৎপাদিত প্লাস্টিকের ঝাড়ু যশোর, খুলনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া এবং ঢাকায় বিক্রয় হয়ে থাকে। রাজধানী ঢাকাতেও এই ঝাড়ুর প্রচুর চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। লাকী বেগমের প্লাস্টিকের ঝাড়ুর বাজার সৃষ্টিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করে।

বর্তমানে লাকী বেগমের ঝাড়ু তৈরি কারখানায় স্থায়ীভাবে ছয়জন শ্রমিক কাজ করে যাদের মোট মাসিক বেতন ১৮,০০০/- টাকা। এছাড়া আরো ১৫জন খণ্ডকালীন শ্রমিক কাজ করে। প্রতি চারজনে একদিনে ১০০টি ঝাড়ু তৈরী করতে পারে। ফলে লাকী বেগমের এই উদ্যোগটি নিজেদের পাশাপাশি আরো কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে তার কারখানায় দৈনিক ১০০-১৫০টি, প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৮০০-১,০০০টি এবং মাসে ৩,৬০০-৪,০০০ টি ঝাড়ু তৈরি হয়। এতে লাকী বেগম মাসিক ১,০৮,০০০/- থেকে ১,২০,০০০/- টাকা মুনাফা থাকে। ঝাড়ু তৈরির কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য পর্যায়ক্রমে আয় থেকে ঝাড়ু তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরির মেশিন ক্রয় করে কারখানায় সংযোজন করে। পর্যায়ক্রমে লাকী বেগম খেজুর পাতার পাশাপাশি ঝাড়ু তৈরীতে বৈচিত্র্য আনার জন্য প্লাষ্টিকের ফাইবার ব্যবহার শুরু করেন যা গ্রাহকের কাছে সমাদৃত হয়। অল্পদিনের মধ্যে তার ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। লাকী বেগমের এ কাজে পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে তার স্বামী মামুন মিয়া তাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করে থাকে। লাকী বেগমের কারখানার আকার বড় হলে সমাজের আরও বেকার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ঝাড়ু বিক্রির লাভের টাকায় তার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিশ্চিত করতে পেরেছে লাকী বেগম। তার বড় মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছোট মেয়ে ৭ম শ্রেণিতে এবং ছোট ছেলে ৫ম শ্রেণিতে পড়ছে। তাঁর স্বপ্ন, ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে একদিন সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

এক সময়ের অভাবী লাকী বেগম ঐকান্তিক চেষ্টা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন নিজের ও স্বামীর কর্মসংস্থান। অভাব এখন আর তার পিছু তাড়া করে না। দারিদ্র্যকে কীভাবে জয় করতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাকী বেগম।

# একজন হার না মানা রেজিয়ার গল্প

মোঃ নিয়ামুল কবীর, প্রোগ্রাম অফিসার (কৃষি)

অভাব অনটনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে হয় দরিদ্র মানুষকে। দীর্ঘ জীবনযুদ্ধে কেউ কেউ সফল হয়। তেমনি এক সংগ্রামী নারী রেজিয়া বেগম। রেজিয়া বেগম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল হামিদ। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে রেজিয়া বেগম ছিলেন পঞ্চম। গ্রামের আর দশটি ছেলে-মেয়ের মতো বেড়ে ওঠা হয়নি তার। দরিদ্র হওয়ায় তাদের ছিল অভাব অনটনের সংসার। নানা রকম সামাজিক বঞ্চনার ভিতর দিয়ে বেড়ে ওঠেন রেজিয়া বেগম। মাত্র ১২ বছর বয়সে নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার বড়তলী গ্রামের আব্দুল খালেকের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে তার বিয়ে হয়। সতীনের ঘরে এসে বেশিদিন সুখী হতে পারেনি রেজিয়া বেগম। বিয়ের এক বছর পর রেজিয়ার কোল জুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। পুত্র সন্তান হওয়ার পর স্বামী ও সতীন মিলে জোর করে রেজিয়া বেগমকে স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে লাইগেশন করিয়ে দেয় যাতে আর ভবিষ্যতে সন্তান না হয়। এরপর থেকে রেজিয়া বেগমের ওপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। স্বামী ও সতীনের নির্যাতন সইতে না পেরে বিয়ের দেড় বছরের মাথায় ছেলেকে সাথে নিয়ে বাধ্য হয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন রেজিয়া বেগম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গেলেও তার স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানের কোনোরকম খোঁজ-খবর না নেয়ায় শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

বিলে হাঁসদের খাবার পরিবেশন করছেন রেজিয়া বেগম

শুরু হয় একমাত্র ছেলেকে নিয়ে রেজিয়া বেগমের বেঁচে থাকার লড়াই। এর একবছর পর মোহনগঞ্জের বড়তলী গ্রামের মোঃ তাইজুল ইসলাম (বর্তমান স্বামী) তার পরিবারকে না জানিয়ে রেজিয়াকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাইজুলের পিতা তাদের এ বিবাহ মেনে নেয়নি এবং বাড়ীতে স্থান দেয়নি। রেজিয়া বেগম ও তার স্বামী অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। রেজিয়া বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করে এবং তার স্বামী রিক্সা চালায়; চলতে থাকে তাদের জীবন। এভাবে দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের

সাথে লড়াই করতে করতে রেজিয়া বেগমের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। রেজিয়া বেগম জানতেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বড়তলী গ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং বড়তলী গ্রামের অনেক মহিলাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমিতিতে সদস্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। রেজিয়া বেগম বড়তলী মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে গিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ফিল্ড অর্গানাইজারকে তার বর্তমান অবস্থার কথা জানান এবং তিনি একটা কিছু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এভাবে ২০০০ সালে রেজিয়া বেগম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বড়তলী মহিলা উন্নয়ন দলের সদস্য হন এবং সাপ্তাহিক ৫/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন।

কয়েক মাস পর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হাঁস-মুরগী পালনের ওপর তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। রেজিয়া বেগম উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর প্রথম দফায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ঋণের টাকা দিয়ে ১০০টি একদিন বয়সী হাঁসের বাচ্চা কিনে পালতে শুরু করেন রেজিয়া বেগম। প্রথম বছরে প্রকল্পটি লাভের মুখ দেখতে পায় এবং নতুন আশায় বুক বাধেন রেজিয়া বেগম। অতঃপর দ্বিতীয় দফায় ৮,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ৩০০টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন তিনি। রেজিয়া বেগমের স্বামী তাইজুল ইসলাম তাকে এ কাজে সহায়তা করেন। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে খামারের কাজটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সবার সহায়তায় প্রতি দফায় বেশ ভালো ব্যবসার মুখ দেখেন রেজিয়া বেগম। কাজের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে যায় তার। খামারকে বড় করার জন্য বিভিন্নভাবে মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করার পাশাপাশি নিজের মধ্যে চিন্তা চলে আসে কি করে খামারের পরিধি আরও বাড়ানো যায়। রেজিয়া বেগম সকল বিষয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেন। রেজিয়া বেগমের আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তি দেখে পরিকল্পিত উপায়ে সঠিকভাবে খামার পরিচালনার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাকে ছয়দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর খামারের এ কাজটি রেজিয়া বেগমের নিজের কাছে আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দপূর্ণ মনে হয়। প্রশিক্ষণের পর ব্যবসার প্রতিটি দিক তার চোখের সামনে আয়নার মতো স্বচ্ছভাবে দৃশ্যমান হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পর রেজিয়া বেগমকে ২০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। রেজিয়া বেগম খামারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে সেই চিন্তা করেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন। এভাবে সফলভাবে উদ্যোক্তা ঋণের ১ম দফার ঋণ পরিশোধ করে উদ্যোক্তা ঋণের ২য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন রেজিয়া বেগম। লাভের টাকা দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে ১২.৫ শতক জমি ক্রয় করেন তিনি। উদ্যোক্তা ঋণের ৩য় দফায় ১০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে পরিকল্পিত উপায়ে খামারের আকার বৃদ্ধি করেন। খামারের আয় থেকে সংসারের বাড়তি আয় করার লক্ষ্যে ভাড়ায় চালানোর জন্য স্বামীকে একটি মটর সাইকেল কিনে দেন রেজিয়া বেগম। তারপর খামরের আয় দিয়ে থাকার ঘর পাকা করেন এবং ঘরের কিছু আসবাবপত্র ক্রয় করেন। এ ছাড়াও নিজের জন্য কিছু স্বর্ণালংকার তৈরি করেন রেজিয়া বেগম। নিজের স্বামীর নিকট তথা সংসারে, পরিবারে ও সমাজে রেজিয়া বেগমের মূল্যায়ন অন্য দশজনের তুলনায় আলাদা হতে থাকে। এভাবে নিজের অধিকার, নিজের মতামত প্রদান ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন পেতে থাকেন রেজিয়া বেগম। সমাজে নিজের একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি হয়। অসচ্ছলতা বলতে যা বুঝায় তা রেজিয়া বেগমের সংসারে আজ আর নেই। এভাবে পর্যায়ক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হতে ১,৫০,০০০/- টাকা গ্রহণ করেন রেজিয়া বেগম। তার হাঁসের খামারে এখন ১০০০ হাঁস আছে। কিস্তি দিতে রেজিয়া বেগমের আদৌ কোনো সমস্যা হয় না।

বর্তমানে তার সংসারে রঙিন টেলিভিশন, খাট, শোকেজ, মোবাইল ফোনসহ প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। অর্থাৎ একটি সচ্ছল পরিবারে যা কিছু থাকার দরকার তার সবই আছে। নিজের পাশাপাশি রেজিয়া বেগমের খামারে যারা কাজ করছে তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করছে এবং তারাও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে আছে। এক কথায় নির্দ্বিধায় বলা যায় রেজিয়া বেগমের এই উদ্যোগটি একটি আদর্শ উদ্যোগ। কারণ এটি এমন একটি উদ্যোগ যার চাহিদা ব্যাপক এবং এর চাহিদা কখনও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বরং চাহিদা দিন দিন বাড়বে। নিজের পাশাপাশি আরও অনেক পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। জাতীয়ভাবেও অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। রেজিয়া বেগম বিশ্বাস করেন আগামী ২/১ বছরের মধ্যে তার এ খামার আরও বড় হলে আরও অনেক পরিবার দরিদ্রতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। সততা আর অধ্যাবসায়ের ফলে একেবারে শূন্য হতে আজ একটি সচ্ছল জীবন নিশ্চিত করতে পেরেছেন রেজিয়া বেগম। একজন সফল উদ্যোগী নারী হিসেবে তিনি এখন এলাকার অন্যান্য নারীদের কাছে অনুকরণীয়।

# পারুলের জীবন সংগ্রাম

মোঃ শামীমুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার

বরিশালের মুলাদি উপজেলার বালিমোদন গ্রামের মেয়ে পারুল। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার মৌতলা গ্রামের আব্দুর রশিদ গাজীর সাথে তার বিয়ে হয়। স্বামী পেশায় বাস ড্রাইভার। সংসারের ব্যয় মেটাতে স্বামীর ড্রাইভারী পেশাই একমাত্র ভরসা। তবুও সকল ব্যয় শেষে কিছু কিছু করে সঞ্চয় করা তেমন কঠিন হয়নি তাদের জন্য কখনো। পুরনো দেখে একটি মাইক্রোবাস কিনবেন, এটাই ছিল তাদের তখনকার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। এভাবে দিন গড়িয়ে বছর চলে যায়। অল্প অল্প করে সঞ্চিত টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। তিলে তিলে জমা করা কষ্টার্জিত টাকার অংক যখন ৩ লক্ষ ৮০ হাজার, তখন সেই টাকায় একটি পুরাতন মাইক্রোবাস শেষ অব্দি কেনা হয় তাদের। স্বামী, এক মেয়ে ও দুই ছেলেসহ পারুলদের ভবিষ্যৎকে ঘিরে তখন কতইনা স্বপ্ন রচিত হতে থাকে প্রতিদিন। কিন্তু বিধি বাম। স্বপ্ন-সুখের জাল বুনতে না বুনতেই মহা দূর্যোগের তিমিরে নিমজ্জিত হয় গোটা পরিবার। মর্মান্তিক এক সড়ক দূর্ঘটনায় প্রাণ হারান সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি স্বামী আব্দুর রশিদ গাজী। বড় মেয়ে রোজিনা (১২), ছেলে রাশেদ (৭) ও ছোট ছেলে রাসেলকে (১১ মাস) নিয়ে পারুল তখন দিশেহারা। নগদ একটি টাকাও রেখে যাননি তার স্বামী, যা দিয়ে সন্তানদের মুখে অন্ন যোগাবেন তিনি। একই বাড়িতে বসবাস করতেন পারুলের দুই দেবর। মাইক্রোবাসকে কেন্দ্র করে প্রথমে বিরোধ এবং পরে শুরু হয় তাদের ওপর অত্যাচার। একসময় পারুল একজন চালক রেখে মাইক্রোবাসটি ভাড়া খাটানোর উদ্যোগ নেন। এতে

গ্রাহককে বিক্রয়ের জন্য কাপড় দেখাচ্ছেন পারুল বেগম

ক্ষিপ্ত হয়ে দেবরদ্বয় মাত্র ৪৫ হাজার টাকায় মাইক্রোবাসটি বিক্রি করে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেন। এতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। অভিভাবকহীন পারুলের পায়ের নীচ থেকে ক্রমেই যেন সরে যেতে থাকে মাটি। এক পর্যায়ে দেবরদ্বয় সন্তানসহ পারুলকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেন। পারুল সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়ি বরিশালের উদ্দেশ্যে কালিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে হাজির হন। কীভাবে যাবেন, কিছুই জানেন না। কেননা সঙ্গে একটি কানাকড়িও নেই, বাস ভাড়া দেবেন কোত্থেকে? এমনকি ১১ মাসের ক্ষুধার্ত শিশুটিকে দু'চামচ চিনির শরবত খাওয়ানোর মতো ১টি টাকাও সাথে নেই। নিজেকে আর সামলাতে পারেন না পারুল, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন

এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি জনৈক পুটু সাহেব। তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। নিয়ে যান পারুলদেরকে নিজ বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়িতেই ঝিয়ের কাজ পাবার মাধ্যমে শুরু হয় পারুলদের নতুন জীবন।

এতকিছুর পরও সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হতে দেননি পারুল। বড় মেয়ে রোজিনা তখন ৭ম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষা দেবে। অথচ একটি বইও কেনা হয়নি তার। এতদিন সহপাঠীদের বই ধার করে এনে পড়াশেষে আবার ফেরত দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা আসন্ন, তাই কেউ আর সেই সহযোগিতা করতে নারাজ। এমতাবস্থায় পারুল মেয়ের পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য অন্যের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পাতেন। অনেক কষ্টে যোগাড় হয় টাকা। এভাবে পরীক্ষার দশদিন আগে বই কেনা হলে রোজিনা তা পড়ে পরীক্ষা দেয় এবং ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হয়।

একদিন জাহানারা নামের একজন প্রতিবেশীর পরামর্শে পারুল কালিগঞ্জে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত 'আশার আলো' মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন এবং সপ্তাহে নিয়মিত ৫টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এভাবেই উক্ত সমিতির মাধ্যমে ৫ হাজার টাকা ঋণ নেয়ার সুযোগ হয় তার। ঋণের টাকা দিয়ে পারুল শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, লুঙ্গি ইত্যাদি কিনে দূর-দূরান্তে গিয়ে ফেরী করে করে বিক্রি করতে শুরু করেন। শুরু হয় পারুলের সংগ্রামী জীবনের আরেক নুতন অধ্যায়। অতঃপর পুটু সাহেবের সহযোগিতায় পারুল সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ সড়কের কোল ঘেষে মোমরেজপুর গ্রামের সরকারি জমিতে ছোট্ট একটি ঝুপড়ি বানিয়ে সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতে থাকেন আর জীবিকা নির্বাহের জন্য চালিয়ে যেতে থাকেন কাপড়ের ব্যবসা।

এরপর কেটে গেছে ১৩টি বছর। পারুল এখনও ফেরী করে কাপড় বিক্রি করেন। মিশন থেকে ঋণ নিয়েছেন মোট নয় বার এবং এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দেড় লক্ষাধিক টাকা ঋণ নিয়েছেন। ঋণ পরিশোধে কখনো অনিয়ম করেননি। বর্তমানে গৃহীত ৫০ হাজার টাকা ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করে যাচ্ছেন।

মেয়ে রোজিনা এসএসসি পাশ করলে ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছেন বেশ ক'বছর হলো। বিয়েতে খরচও করেছেন প্রায় ৩০ হাজার টাকা। ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ করে ঝুপড়ির জায়গায় তুলেছেন ৬ কক্ষের টিনশেড বিল্ডিং। দু'টির একটিতে থাকেন দুই সন্তানসহ আপন এক বোন, অন্যটিতে দুই সন্তানসহ নিজে। অপর ৪টি কক্ষ ভাড়া দিয়েছেন। অষ্টম শ্রেণি পাশ বড় ছেলে রাশেদকে ৫ হাজার টাকা দিয়ে কিছু যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছেন। ছোটখাট গাড়ি মেরামতের কাজ শুরু করেছে সে। নিজের কাপড়ের ব্যবসায় পুঁজি খাটছে ৫০ হাজার টাকা। পারুল ঘর ভাড়া থেকে মাসে ৩ হাজার ৬ শত টাকা পান। কাপড়ের ব্যবসা থেকে আয় হয় মাসে অন্তত ১০-১২ হাজার টাকা। এ ছাড়াও হাঁস, মুরগী আর ছাগল পালন করে বছরে প্রায় ২-৩ হাজার টাকা আসে। বড় ছেলে গাড়ি মেরামত করে কিছু পেলেও এই মুহূর্তে তাকে সংসারের ব্যয়ে অংশীদার বানাতে অনিচ্ছুক তিনি। ছেলেকে একটি ওয়ার্কশপের মালিক হতে সহযোগিতা করাটাই তার আসল স্বপ্নগুলোর একটি। ছোট ছেলে রাসেল পড়ছে ৬ষ্ট শ্রেণিতে। তাকে পড়াশুনা করে অনেক বড় হতে হবে, এটিও পারুলের আরেকটি স্বপ্ন। আর যে স্বপ্ন তিনি অন্তরে লালন করে আসছেন দীর্ঘদিন যাবৎ, শুধু বাড়তি টাকার অভাবেই পেরে উঠছেন না, তা হলো-একটি দোকানে বসে কাপড় বিক্রি করা। দোকানটি সদর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে কোন মার্কেটে হলে ভালো হয়। যেখানে থাকবে বৈদ্যুতিক বাতি, কাঁচের শো-কেসে থরে থরে সাজানো থাকবে রং-বেরঙের শাড়ি, লুঙ্গি, জামা-কাপড়সহ আরো কত কি। পারুল দোকানে বসে তা বিক্রি করবেন। ঘুচে যাবে তার এক যুগেরও অধিককাল সময় ধরে পায়ে হেঁটে ফেরী করে কাপড় বিক্রি করার কষ্ট। পারুল এই স্বপ্ন অর্জনের জন্য অব্যাহত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

# সালেহা বেগমের দারিদ্র্য জয়

দুলাল চন্দ্র দেবনাথ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়তে চাইলে প্রয়োজন ইচ্ছাকে কর্মদক্ষতায় রূপান্তরিত করা। ইচ্ছা, কর্মদক্ষতা ও মনোবলের মাধ্যমে শত বাধা অতিক্রম করে জীবনে উন্নয়ন এনে শান্তির নীড় রচনা করা যায়, তারই উদাহরণ সালেহা বেগম। নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী ইউনিয়নের মহিষাটি গ্রামে সালেহা বেগমের জন্ম। তার পিতা একজন দরিদ্র তাঁতি ছিলেন। সালেহা বেগমেরা ছিলেন তিন ভাইবোন। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। এরপর অভাবের তাড়নায় এবং যৌতুকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মাত্র ১৬ বছর বয়সে একই গ্রামের দিনমজুর গাফফার মিয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সালেহা বেগমকে বিয়ে দেয়া হয়। পাঁচ বছরের মাথায় পর পর তিনটি সন্তানের মা হন সালেহা বেগম। দুই ঘরের সন্তান মিলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ জন। সালেহা বেগমের স্বামীর একার উপার্জনে সংসার ভালোভাবে চলত না। অশান্তি এবং অভাব ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষা এবং সচেতনতায় নারীরা পিছিয়ে রয়েছে বিধায় নারী শুধু জনসংখ্যা হিসেবে গননায় এসেছে। জনসম্পদের গণনায় তেমনভাবে আসতে পারেনি। বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কিছু সরকারি-বেসরকারি সংস্থা নারীদের এই কর্মশক্তির সফল ব্যবহার করে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এমনই একটি স্বনামধন্য উন্নয়ন সংস্থা যা শিক্ষা,

নিজের তাঁত কারখানায় পাওয়ারলুমে কাজ করছেন সালেহা বেগম

স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, দারিদ্র্য বিমোচন, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী ইউনিয়নের মহিষাটি গ্রামের গ্রামবাসীরা ২০০১ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় একতা নামে একটি গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত লোকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। সালেহা বেগম প্রতিবেশীদের পরামর্শে গণকেন্দ্রে সম্পৃক্ত হন এবং সুযোগ পেলেই গণকেন্দ্রে যাওয়া-আসা শুরু করেন। গণকেন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং অন্যদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে তার দৃষ্টি খুলে যায়। জীবনে উন্নতি করার চিন্তা মাথায় আসে। সংসারের অভাব অনটনের বেড়াজাল থেকে নিজেকে বের করে আনতে ইচ্ছে হয়। এরমধ্যে সংসারের টানাপোড়ন

বেড়ে যায়। অভাবের তাড়নায় সালেহা বেগম দারিদ্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অন্যের তাঁত কারখানায় কারিগর হিসেবে কাজ শুরু করেন। কারন তাঁতি পিতার কাছ থেকে শৈশবেই তাঁতের কাজের সমস্ত কলাকৌশল সালেহা বেগমের জানা ছিল। তখন থেকেই কীভাবে নিজে অন্তত একটি তাঁত কিনে কাজ শুরু করতে পারেন তা ভাবতে শুরু করেন সালেহা বেগম। তার হাতে তখন কোনো পুঁজি ছিল না। সালেহা বেগম তার পরিচিতজনদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং অনেকের কাছে কিছু টাকা ঋণ চেয়েও ব্যর্থ হন। এই সময় ২০০২ সনে মহিষাটি গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত একতা গণকেন্দ্রের সদস্যদের উদ্যোগে একতা মহিলা উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়। সালেহা বেগম এই সমিতির একজন সদস্য হন। সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ। এভাবেই সালেহা বেগম ২০০২ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি হস্তচালিত তাঁত ক্রয় করে নিজেদের বাড়ির একটি ঘরে বস্ত্র উৎপাদন শুরু করেন। তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের কাজে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে শ্রম দিতে থাকেন। প্রথম দিকে তার উদ্যোগটি হতে শুধু সাদা কাপড় তৈরি হয় যা প্রসেসিংপূর্বক বিভিন্ন রকম বেড সিট, লালসালু, শাড়ি ইত্যাদি তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সফলতা আসতে থাকে, ফলে সংস্থার ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে অসুবিধা হয় না। তার উত্তরোত্তর অগ্রগতি দেখে সংস্থা তাকে ক্ষুদ্রঋণী থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচন করে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ প্রদান করে। মুনাফার টাকা থেকে ধীরে ধীরে সালেহা বেগম প্রতি বছর তাঁতের সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। বর্তমানে সালেহা বেগম একটি যন্ত্রচালিত তাঁত ফ্যাক্টরির মালিক। এই ফ্যাক্টরিটি তিনি তার মেয়ে পারুলের নামে 'পারুল টেক্সটাইল' রেখেছেন যার Trade License No.- 161। সালেহা বেগমের ফ্যাক্টরিতে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ শাড়ি উৎপাদন হয়। শাড়ি এবং কাপড় উৎপাদন করে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩৬০,০০০/- টাকা মুনাফা অর্জন হয়। সালেহা বেগমের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত কাপড় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন রংপুর, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর পর্যন্ত যাচ্ছে।

গত আট বছরে ঋণ গ্রহণ করে এবং অর্জিত মুনাফা থেকে সালেহা বেগম এ যাবৎ ৩৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন, ফ্যাক্টরির জন্য ঘর তৈরি করেছেন এবং ৩০টি যন্ত্রচালিত তাঁত ক্রয় করেছেন। সালেহা বেগমের ফ্যাক্টরিতে মোট ২৬ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে ২০ জন পুরুষ ৬ জন মহিলা। বর্তমানে সালেহা বেগমের সংসারে একটি সচ্ছল সংসারে যা কিছু থাকার দরকার তার সবই আছে। সালেহা বেগমের নিজ ছেলে-মেয়ের পাশাপাশি তার ব্যবসায় যারা কাজ করছে তাদের ছেলে-মেয়েরাও লেখাপড়া করছে এবং তারাও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে আছে। এজন্য নির্দ্বিধায় বলা যায় সালেহা বেগমের এ উদ্যোগটি একটি আদর্শ উদ্যোগ। কারণ এটি একটি সৃজনশীল ব্যবসা যার চাহিদা ব্যাপক এবং চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সালেহা বেগমের তাঁত ফ্যাক্টরিটি সম্প্রসারিত হলে জাতীয়ভাবেও তাঁত শিল্পে অবদান রাখা সম্ভব হবে। সালেহা বেগম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এই ধরণের উদ্যোগ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিস্তৃত হলে তার নিজের মতো আরও অনেকের দরিদ্রতা দূর হবে এবং দেশের কাপড় উৎপাদনের চাহিদা মেটাতে তা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও মহিলাদের কাজে অনেক বাধা রয়েছে। যত প্রতিভা বা দক্ষতাই থাক না কেন সবার আগে স্বামী ও সংসারের দায়িত্ব পালন তারপর অন্য কথা। সালেহা বেগমের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম দিকে বেশ হোঁচট খেতে হয়েছে, অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে, তবে সালেহা বেগম অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মিশনকর্মীদের উৎসাহ এবং সহযোগিতার কারণে হাল ছাড়েননি। আস্তে আস্তে সকল বাধা দূর হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসলে, সততা থাকলে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে পারলে কোন বাধাই কাউকে আটকাতে পারেনা। ক্রমশ যখন সালেহা বেগমের ব্যবসায় আয় বাড়তে থাকে, তখন স্বামী এবং পরিবারের লোকজন তাকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আয় থেকে নতুন যন্ত্রচালিত তাঁত ক্রয় এবং কর্মচারী নিয়োগ করেন সালেহা বেগম। সংসার এবং ব্যবসার কাজ করার জন্য পরিকল্পিত সময়সূচি মেনে চলেন। পরিবারের সদস্যরা যখন দেখেছে তিনি একটি লাভজনক কাজে জড়িত তখন তারা তার বুদ্ধি এবং মতামতের দাম দিয়েছে। তিনিও যেকোনো বিষয়ে স্বামী এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের মতামত-এর গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে পরিবার এবং উদ্যোগ একই সাথে পরিচালনা করতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। আজ সমাজের অন্যান্য মহিলা যারা ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে জড়িত নয় তাদের তুলনায় সালেহা বেগমের অবস্থান বর্তমানে অনেকটাই অগ্রগামী। তার দক্ষতা এবং যোগ্যতা পরিবার-পরিজন এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। সালেহা বেগম নিজেকে আজ শুধু নারী নয় একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ বলে মনে করেন।

# মাশরুম চাষে রাশিদার সাফল্য

মোঃ রেজাউল ইসলাম, সিঃ প্রোগ্রাম অফিসার

মহেশপুর উপজেলার যুগিহুদা গ্রামের একজন গৃহিনী, সফল উদ্যোক্তা ও সমাজ উন্নয়নকর্মী রাশিদা বেগম। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' এর নিকট থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে নিজের প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতা প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত রাশিদার জীবন ছিল দারিদ্র্যের খাঁচায় বন্দী এবং হতাশাচ্ছন্ন। মহেশপুর উপজেলার সাজিয়া গ্রামে রাশিদা বেগমের জন্ম। রাশিদারা ছিলেন ১০ ভাইবোন। ভাইবোনদের মধ্যে রাশিদা বেগম ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তার পিতা খাদেমুল ইসলাম ছিলেন একজন দিনমজুর।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় মাত্র ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছিল রাশিদা বেগমের। ছোটবেলা থেকেই অভাব ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রাশিদা বেগমের বিয়ে হয় একই উপজেলার যুগিহুদা গ্রামের মোঃ আসাদুর রহমানের সাথে। স্বামী মোঃ আসাদুর রহমান ছিলেন একজন দরিদ্র বর্গাচাষী। বসতভিটা ছাড়া তার আর কোনো জমি-জমা ছিল না। রাশিদা বেগম জীবনের আরেক কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয় স্বামীর সংসারে এসে। অভাব তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকে। এরই মধ্যে দু'টি সন্তানের মা হন রাশিদা বেগম। সংসারের এই টানাপোড়েন থেকে বের হয়ে আসার একটি সুযোগ খুঁজতে থাকেন রাশিদা বেগম। এরই মধ্যে প্রতিবেশীদের কাছে রাশিদা জানতে পারেন যে যুগিহুদা গ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐ গণকেন্দ্রে সাক্ষরতা চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনা, বই, পুস্তক ও পত্রিকা পড়ার সুযোগ আছে।

মাশরুম সেডে কর্মরত রাশিদা বেগম

রাশিদা বেগম অনেক আগ্রহভরে একদিন গণকেন্দ্রে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি দেখতে পান গ্রামের নিরক্ষর মহিলা ও শিশুরা লেখাপড়া শিখছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাশিদা পরশমনি গণকেন্দ্রের সদস্য হন। কিছুদিনের মধ্যে গণকেন্দ্র থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বাড়িতে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে গণকেন্দ্রের সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনে সহায়তার জন্য গঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্রঋণ মহিলা দলেরও সদস্য হন রাশিদা বেগম। প্রকৃতপক্ষে দলীয় সাপ্তাহিক সভায় উন্নয়নকর্মী কর্তৃক আলোচিত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সমস্যাসমূহ, সঠিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচন এবং ঋণের সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কিত বিষয়গুলো তার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ

করে। তিনি জানতে পারেন অনেকগুলো আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় কর্মকাণ্ডটি কীভাবে বেছে নিতে হয়। তাই রাশিদা বেগম তাড়াহুড়ো করে ঋণ গ্রহণ না করে সাপ্তাহিক ১০ টাকা সঞ্চয় জমা করতে থাকেন এবং নিয়মিতভাবে দলীয় সাপ্তাহিক আলোচনাসমূহ মনোযোগ সহকারে শুনে ও যে বিষয়গুলো তার বুঝতে অসুবিধা হয় তা প্রশ্ন করে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেন।

কয়েক মাস পরে ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং পারিবারিক উপার্জন বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রথম দফায় মিশন থেকে ৫,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্পে ঋণ নিয়ে কয়েকটি হাঁস-মুরগি ও একটি ছাগল ক্রয় করেন। এতে প্রথম বছর তার বেশ কিছু আয় হয়। এভাবে তিনি আরও দুই দফা ঋণ গ্রহণ করে সাধারণ আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী লাভজনক একটি কর্মকাণ্ড নির্বাচনের জন্য চিন্তা করতে থাকেন। রাশিদা বেগমের আগ্রহ দেখে মিশনের কৃষি কর্মকর্তা তাকে মাশরুম চাষ করার পরামর্শ দেন এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলেন। এ ছাড়াও তিনি গণকেন্দ্রে সংরক্ষিত মাশরুম চাষের পদ্ধতি শীর্ষক একটি বই পড়ার জন্য বলেন। রাশিদা বেগম বইটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েন। রাশিদা জানতে পারেন মাশরুম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন সবজি। মাশরুম একদিকে শরীরের প্রোটিন চাহিদা পূরণ করে অন্যদিকে সবজির সকল গুণাবলী বহন করে তাই অত্যন্ত সংগত কারণেই একে সবজি-মাংস বলা হয়। এ ছাড়া মাশরুমের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও খুবই ভালো। এভাবেই রাশিদা বেগম মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হন।

রাশিদা বেগম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্থানীয় শাখা ব্যবস্থাপকের সহায়তায় উপজেলা কৃষি অফিস থেকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হতে মাশরুম চাষের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং বাড়ির পাশে একটি আলাদা ঘরে বাঁশ দিয়ে মাশরুমের জন্য মাচা/শেড তৈরি করেন। এরপর যশোর থেকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪০০ প্যাকেট মাশরুম-এর বীজ এনে মাশরুম চাষ শুরু করেন। ১৫দিন পর হতে প্রতিদিন গড়ে দুই কেজি মাশরুম উৎপাদিত হতে থাকে যা থেকে গড়ে দৈনিক ৩০০ টাকা করে আয় থাকে। মাশরুম উৎপাদনের শুরুতে এর গ্রাহক পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে রাশিদা বেগমের যথেষ্ট সংশয় ছিল।

মহেশপুর উপজেলায় মাশরুমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে কৃষি বিভাগ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিশেষ উদ্যোগ এবং প্রচারণা ইতোমধ্যেই স্থানীয় জনগণের মধ্যে মাশরুমের চাহিদা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের উদ্যোগে ডায়াবেটিস এবং কিডনী রোগীদের মাঝে মাশরুমের ঔষধিগুণের কারণে একটি বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়াও রাশিদা বেগম স্বামী মোঃ আসাদুর রহমানের মাধ্যমে যশোরের কয়েকটি চায়নিজ রেস্ট্রুরেন্টে মাশরুম বিক্রয়ের চেষ্টা করে ইতিবাচক সাড়া পান। এভাবেই মাশরুম উৎপাদনে রাশিদা বেগমের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে রাশিদা বেগমের মাশরুম শেডে ১০০০-এর ওপরে মাশরুম প্যাকেট রয়েছে।

রাশিদা বেগম ধীরে ধীরে মাশরুম চাষ থেকে উপার্জিত অর্থ হতে ৪টি গরু, ৮টি ছাগল এবং একটি মুরগীর ফার্ম করেছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহায়তায় বাড়িতে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট করেছেন যা দিয়ে বাড়ির রান্নার কাজ চলছে। এ ছাড়াও নিজেদের জন্য ঘর তৈরি করেছেন এবং এক বিঘা জমি কিনেছেন। তার বড় ছেলে এস.এস.সি পাস করেছে। তিনি এখন ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর চিন্তা করছেন। ধীরে ধীরে কখন যে সংসারে সচ্ছলতা আসার পাশাপাশি পরিবারে ও সমাজে রাশিদা বেগমের নিজের অবস্থান এবং গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তিনি নিজেও জানেন না। রাশিদা বেগম তার সৎ স্বভাব এবং বিচক্ষণতার জন্য গ্রামের সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় সকলের অনুরোধে গত নির্বাচনে ফতেপুর ইউনিয়ন থেকে ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। রাশিদা বেগম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন গ্রামের প্রতিটি নারী-পুরুষ কাজ করলে গ্রাম উন্নত হবে এবং দরিদ্রতা থাকবে না। ব্যক্তিগত সাফল্য রাশিদা বেগমকে দলীয় কার্যক্রমে আরও গতিশীল করেছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেলেও রাশিদা বেগম দলীয় সভায় সময়মত উপস্থিত হতে ভুল করেন না। তিনি সভায় উপস্থিত হয়ে অন্যান্য সদস্যাদের স্বাবলম্বী হতে বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশনা এবং উৎসাহ প্রদান করেন। সত্যিই মাশরুম চাষ রাশিদা বেগমের জীবনে খুলে দিয়েছে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। এই রাশিদা হয়ে উঠুক হাজার সংগ্রামী নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের পথিকৃত।

# জীবিকায়নের চিত্র

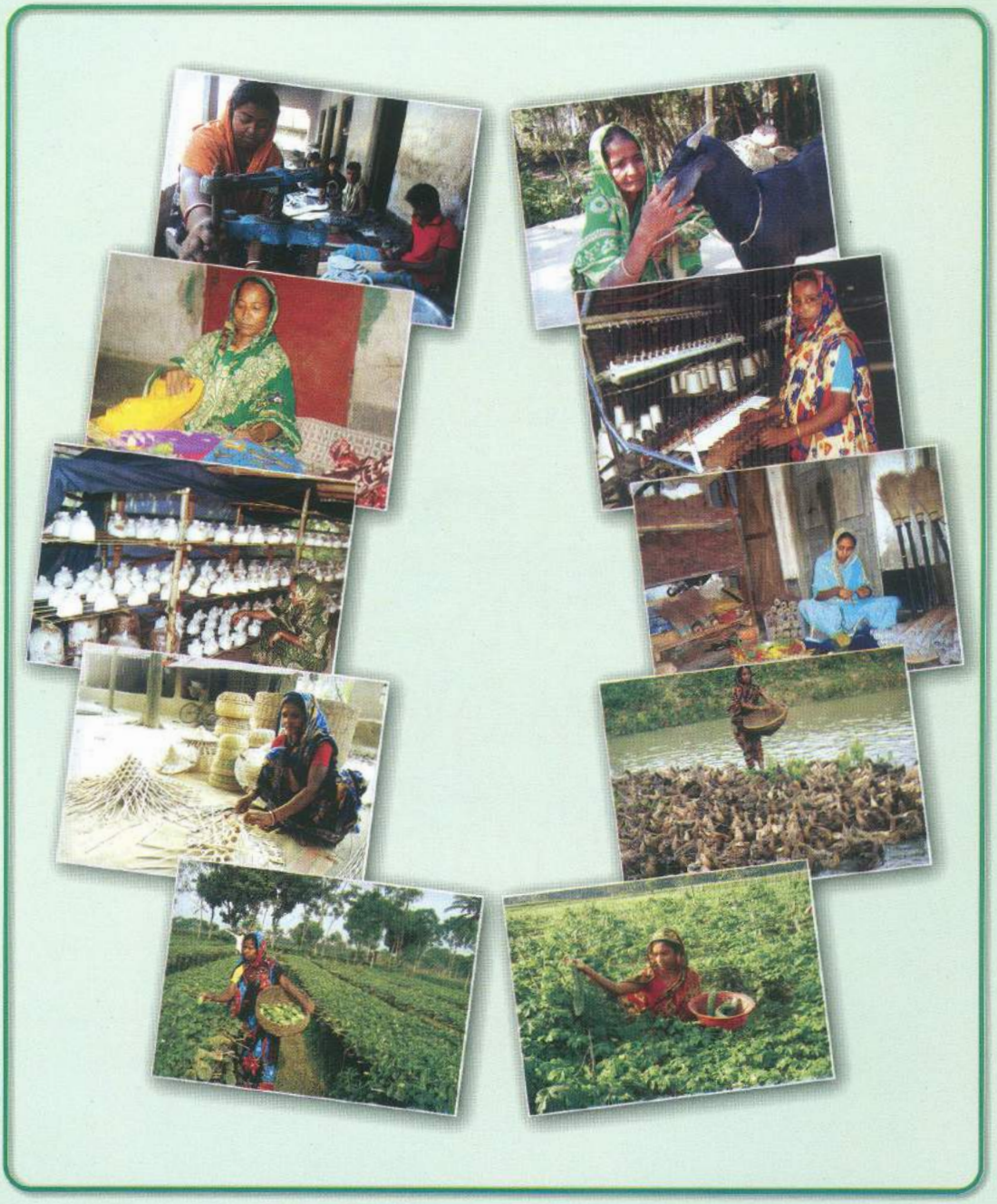

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি

## ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাড়ি # ১৯, সড়ক # ১২ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স ঃ (৮৮০-২) ৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০
E-mail : dam.bgd@ahsaniamission.org
Website : www.ahsaniamission.org.bd